বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা

—আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

অন্যান্য প্রকার গবেষণার তুলনায় সামাজিক গবেষণায় ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে এবং জনগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বেশী দেখা যায়। কারণ, সামাজিক গবেষণায় যে কোন সামাজিক সমস্যার কার্য–কারণ সম্পর্ক, পারস্পরিক তুলনা কিংবা কারণ ও সমাধান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকে, তাই এসব বিষয়ে জনমতের যেমন ব্যাপক গুরুত্ব থাকে, তেমনি ক্ষৈত্রিক পর্যায়ের তারতম্য প্রাধান্য লাভ করে।

এক কথায় বলা যায় যে, সামাজিক গবেষণার তথ্য/কাঁচামাল বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে আহরিত হয়। যেহেতু সামাজিক গবেষণায় ব্যক্তিমতের প্রধান্য বেশী, সেহেতু ব্যক্তির মত যথার্থভাবে আহরিত ও বিশ্লেষিত না হলে প্রতিবেদনের যথার্থতা বিচার্য বিষয়ে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের দুটি পর্যায়ে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম পর্যায়কে " প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা" এবং দ্বিতীয়টিকে "তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা" বলে অভিহিত করা যায়। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা সমুহের সমাধানে গবেষক নানা প্রকার প্রয়াস চালাতে পারেন। অনেক সময় সেগুলো বহুলাংশে দূর করতে পারেন। কিন্তু তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যার খুব সামান্য অংশই সমাধানের ক্ষমতা গবেষকের থাকে, বিপুল অংশই তার আয়ত্বের বাইরে অবস্থান করে।

১। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যার মধ্যে (ক) সংজ্ঞা নির্ধারণ জনিত সমস্যা (খ) নমুনায়ন জনিত সমস্যা (গ) পরিমাপের স্কেল নির্ধারণ জনিত সমস্যা ও (ঘ) 'একক' নির্বাচন জনিত সমস্যা অন্যতম বলে বিবেচিত হয়।

১। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যাবলী বিশ্লেষিত অবয়বে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

ক) সংজ্ঞা নির্ধারণঃ সামাজিক গবেষণায় প্রতিটি প্রত্যয় (Concept) কে একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তব সংজ্ঞা দ্বারা সীমায়িত করতে হয়, যাতে ঐ প্রত্যয় দ্বারা নির্ধারিত একটি বিষয়কে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। যেমন 'শিক্ষক' একটি প্রত্যয়। গবেষণার ক্ষেত্রে এই

প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষক অর্থে (১) ব্যক্তিটি কি পরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হবে, (২) আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক– কোন্ প্রকারের শিক্ষাদানে রত থাকবে, (৩) খণ্ডকালীন, সাময়িক বা নিয়মিত শিক্ষাদান কর্ম চালু রাখবে, (৪) বেতন গ্রহণকারী নাকি অগ্রহণকারী হবে, (৫) প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চতর–কোন পর্যায়ে শিক্ষাদান করবে, (৬) শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করবে নাকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে (টুইশনি) শিক্ষকতা করবে, (৭) কত বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবে–ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল প্রকার সীমা নির্ধারণ করতঃ 'শিক্ষক' প্রত্যয়টির কার্যকরী সংজ্ঞা (Working definition) পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। তা যদি না করা হয়, তাহলে কেবলমাত্র সংজ্ঞার অভাবে প্রত্যয়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হবে না। শুধু তাই নয়, প্রদত্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে বাস্তবতার এবং অন্যান্য গবেষকদের প্রদত্ত সংজ্ঞার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অন্যথায় প্রত্যয়টিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত গবেষণার মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া যথার্থ হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৬১ সালের আদম– শুমারীর সময় 'শিক্ষিত' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নিধারণ করা হয় যে, "যে ব্যক্তি যে কোন ভাষায় কিছু পড়তে পারে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হবে" সেই সংজ্ঞা অনুসারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ ভাগ বলে গণনা করা হয়। ঐ একই সংজ্ঞা অনুসারে ১৯৬৯ সালে পরিচালিত এক জরীপে শিক্ষিতের হার নির্ধারিত হয় শতকরা ২৬ভাগ। ১৯৭৪ সালের আদম শুমারীকালে বাংলাদেশে "শিক্ষিত" প্রত্যয়টিকে এভাবে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করা হয় "যে ব্যক্তি বাংলা ভাষায় নাম ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারে, সেই শিক্ষিত"। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গণনায় শতকরা ১৯ ভাগ শিক্ষিত এদেশে পাওয়া যায়। ১৯৮১ সালের আদম শুমারী কালে পুনরায় সংজ্ঞা পরিবর্তন করে ধার্য হয় যে, "যে ব্যক্তি বাংলাভাষায় কমপক্ষে একটি চিঠি লিখতে ও পড়তে পারে, তাকেই শিক্ষিত ধরা হবে" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষিতের হার গণনায় শতকরা ২৩ ভাগ পাওয়া গেছে।

এখন যদি কেউ এদেশের শিক্ষার হার বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তিনি ১৯৬১ ও ১৯৮১ সালের হারের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে হতাশ হবেন। এখানে যে "শিক্ষিত" প্রত্যয়টির সংজ্ঞা তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে, তা তিনি মূল জরীপের দলিল না খুঁজে কিছুতেই জানতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক পর্যালোচনায় মারাত্মক ভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। ঠিক তেমনি বাড়ী বা খানা, পরিবার, গ্রাম, পাড়া, প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞা পরিবর্তনে এদেশের আদমশুমারী প্রতিবারই করিৎকর্মতার পরিচয়

দিয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় এদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার না ৮৪ হাজার, নাকি ৯০ হাজার, তা নিয়ে পাঠকদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি এক দফায় এই প্রত্যয়গুলোর কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণে সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করে ঐকমত্য সৃষ্টি করা হতো, তাহলে এরূপ বিভ্রান্তি বার বার দেখা দিতো না।

সামাজিক গবেষকের পক্ষে একটি দুরূহ বিষয় এই সংজ্ঞা নির্ধারণ। যেমন-'আয়' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণে গৃহে পালিত হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয় কিংবা গৃহিণীদের সাময়িক কোন হস্তশিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়কে যোগ করা হয় না। অনেক অর্থনীতিবিদ তাই বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান "মাথা পিছু গড় আয়" কে যথার্থ বলে মেনে নিতে রাজী হন না। তাঁদের মতে জাতীয় আয় গণনায় এরূপ বহুপ্রকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তথ্য প্রাপ্তির ত্রুটি বিচ্যুতি এদেশে বিদ্যমান রয়েছে।

(খ) **নমুনায়নঃ**- বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার জন্য সঠিক ও যথার্থ নমুনায়ন বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। প্রধানতঃ নমুনায়নকে দুটি প্রকারে ভাগ করা হয়, (i) সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন, যেমন ঃ-দৈব চয়ন, স্তরিত নমুনায়ন, গুচ্ছ নমুনায়ন ও পদ্ধতিগত নমুনায়ন।

(ii) সম্ভাবনাহীন/উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন, যেমন অংশ মাফিক নমুনায়ন (Cota) আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental) ও ইচ্ছা মাফিক নমুনায়ন (Purposive)। কাগজে কলমে বেশীর ভাগ সামাজিক গবেষক 'দৈব নমুনায়নের' কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'ইচ্ছা মাফিক (Purposive) নমুনায়ন' ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে (Non-probability) সম্ভাবনাহীন নমুনায়নের অধিক ব্যবহারের ফলে "Sampling Eror" বা নমুনাজনিত বিচ্যুতি সামাজিক গবেষণায় অনেক বেশী অনুপ্রবেশ করে।

জানা গেছে যে, সামাজিক গবেষকগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান।কিন্তু বাংলাদেশে সামজিক গবেষণার চাষ মাত্র কিছুদিন আগে আরম্ভ হওয়ায় এখনও গবেষকের অর্থ ও জনবল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খুবই কম থাকে। এরূপ অবস্থায় দৈব চয়নে নির্ধারিত নমুনা ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার বিড়ম্বনা ও অনুপস্থিতি জনিত বিলম্ব মেনে নেয়া প্রায়শঃই গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয়না। যার ফলে তাদের অধিকাংশই দৈব নমুনায়নের কথা প্রতিবেদনে লিখলেও উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন দ্বারা তথ্য সংগ্রহে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে গবেষকের সহায়তায় নিযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারীগণ অনেক সময় নির্দিষ্ট নমুনা ব্যক্তিকে খুঁজবার কষ্টটুকু স্বীকার না করে হাতের কাছে যাকে পান, তারই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

আরেকটি সমস্যা নমুনায়নের সঙ্গে জড়িত থাকে, তা হলো—এদেশে রাস্তাঘাট তেমন সুগম নয় এবং অনেকস্থানে যাতয়াত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দৈব নমুনায়নে বান্দরবনের লামা বা কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার নাম আস্‌লে সুকৌশলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গবেষকের গত্যন্তর থাকে না।

(গ) **পরিমাপের স্কেল নির্ধারণঃ**– পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সম্প্রতিকালে এদেশে সামাজিক গবেষণা কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। তাই এখন পর্যন্ত গবেষকদের তেমন কোন শক্তিশালী সমিতিও নেই, যারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বিভিন্ন প্রত্যয় পরিমাপের স্কেল নির্ধারণ করবেন। ফলে এদেশে 'বিত্ত' বিভাজন জনিত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কেউ ১২টি, কেউ, ৯টি, কেউ ৫ টি এবং কেউ ৩টি শ্রেণী নির্ধারণ করেন। একটি তালিকায় বাংলাদেশে ব্যবহারকৃত বিত্তের শ্রেণী বিভাগ দেখানো হলোঃ–

বিত্তের শ্রেণী বিভাগ

১। উচ্চ বিত্ত	১। উচ্চ বিত্ত	১। উচ্চ উচ্চ বিত্ত
	২। নিম্ন উচ্চ বিত্ত	২। মাধ্যম উচ্চ বিত্ত
		৩। নিম্ন উচ্চ বিত্ত
২। মধ্য বিত্ত	১। উচ্চ মধ্যবিত্ত	১। উচ্চ মধ্যবিত্ত
	২। নিম্ন মধ্য বিত্ত	২। মধ্যম মধ্যবিত্ত
		৩। নিম্ন মধ্যবিত্ত
৩। নিম্ন বিত্ত	১। উচ্চ নিম্নবিত্ত	১। উচ্চ নিম্নবিত্ত
	২। নিম্ন নিম্নবিত্ত	২। মধ্যম নিম্নবিত্ত
		৩। নিম্ন নিম্নবিত্ত
		১। সাধারণ বিত্তহীন
		২। চরম বিত্তহীন
		৩। প্রকট বিত্তহীন

এরূপ বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিভাগ বা পরিমাপের স্কেল নির্ধারণের ফলে সমাজের স্তর বিন্যাসের যথার্থতা কঠিন প্রশ্নের মাঝে নিপতিত হয়। শুধু তাই নয়, বিত্তের পরিমাপক স্কেলে শুধুমাত্র ভূমিকে পরিমাপক ধরা হবে, নাকি উপার্জন বা আয়কে ধরা হবে সেটাও

নির্ধারণ করা যায়না। যেমন ধরা যেতে পারে যে, শহরের একজন রিক্সাচালকের কোন জমি নাই, এমনকি রিক্সাখানাও ভাড়া করা। কিন্তু তার মাসিক আয় ৩–৪ হাজার টাকা। অপর পক্ষে গ্রামের একজন নিম্নবিত্ত, যার জমি ২ .৫০ একর রয়েছে। কিন্তু তার মাসিক আয় ১ হাজার টাকাও নয়। এক্ষেত্রে রিক্সাওয়ালাকে সামাজিক স্তর বিন্যাসে "ভুমিহীন" দেখালে তা কিরূপ যথার্থ হবে? বাংলাদেশে পরিমাপক স্কেল নির্ধারণে কোন প্রকার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় একেকজন একেকভাবে এসব প্রত্যয়ের পরিমাপক নির্ধারণ করে থাকেন।

(ঘ) একক (Unit of Analysis) নির্বাচন ঃ সামাজিক গবেষণায় কোন বিষয়ের একক নির্বাচন করতঃ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেই একক থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে একক নির্বাচন যে কোন গবেষকের নিকট বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, **'পরিবার'** নামক এককটি কিভাবে গঠিত হবে, সে বিষয়ে কোন ঐকমত্য নেই। কেউ শুধু স্বামী–স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে, কেউবা স্বামী– স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সংগে বাবা–মা ও ভাই বোন জুড়ে দিয়ে, কেউ আবার এগুলোর সঙ্গে অন্যান্য পোষ্য জুড়ে দিয়ে **'পরিবার'** নামক একক গঠন করেন। এর ফলে একটি গবেষণায় প্রাপ্ত পরিবারের তথ্যাদির সঙ্গে অন্য গবেষণায় প্রাপ্ত পরিবারের তথ্যাদি তুলনীয় হয়না। একজন নবীন গবেষক কোন্‌টিকে একক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবেন–সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হিমসিম খান।

দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যার চরিত্র কিছুটা ভিন্নতর বলে প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ এই সমস্যাগুলো তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রিক পর্যায়ে উদ্ভুত হয়। এগুলো দূর করার ক্ষমতা প্রায়শঃই গবেষকের থাকেনা। বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যাগুলো পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হলোঃ—

(১) উত্তর দাতাদের মূল্যবোধঃ বাংলাদেশে এমন কিছু মূল্যবোধ প্রচলিত রয়েছে, যা সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়। যেমন, এদেশে যৌনজীবন সম্পর্কে আলোচনা বা তথ্য প্রদানকে প্রায় সকলেই লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করে। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি দুস্কর হয়। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তাগিদে এই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সামাজিক জরীপ ও গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় বেশীর ভাগ গবেষণায় প্রকৃত তথ্য বের করে আনা সম্ভব হয়নি। সেজন্য নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারকারীর প্রকৃত সংখ্যা অনেকটা কল্পনা প্রসূত হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ ভাবে কোন বিষয়ে প্রচলিত প্রথা বা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য

চাওয়া হলে নৈর্ব্যক্তিক উত্তর পাওয়া যায়না। উত্তরদাতাগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে ফেলেন এবং সেভাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করে যান।

(২) **উত্তর দাতাদের নিরক্ষরতা ঃ** নিরক্ষরতার ফলে উত্তরদাতাগণ সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। তাই প্রাপ্ত তথ্য সঠিক হয়না। যেমন "মাসিক আয় নির্ধারণ" বা "বয়সের হিসাব" প্রদানে নিরক্ষর উত্তরদাতাগণ তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। যারফলে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ সঠিক পথে প্রবাহিত হয়না। বেশ কিছু প্রশ্নপত্রের প্রাপ্ত উত্তরে দেখা গেছে যে, উত্তরদাত্রী (মহিলা) তার বয়স ও তার ছেলের বয়স এক করে ফেলেন বা অবিশ্বাস্য কোন অংক বলে ফেলেন। নিরক্ষরতার ফলে উত্তরদাতাগণ তাদের কল্যাণকর কোন মতামতও রাখতে সক্ষম হন না।

(৩) **সঠিক উত্তর না দেয়ার প্রবনতাঃ** ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এদেশের জনগণ প্রাশাসক বা সরকারী লোকদেরকে বিশ্বাস যেমন করেন না, তেমনি যথেষ্ট ভয় করেন। তাই যখন তাদের আয় বা জমির হিসাব জানতে চাওয়া হয়, তখন তারা প্রকৃত তথ্য না দিয়ে কম বলে থাকেন। তাদের ভয় থাকে যে, না জানি নতুন কোন বিপত্তি দেখা দেয়। ফলে কৃষি শুমারী বা অনুরূপ গবেষণা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

প্রকৃত তথ্য না দেবার আরেকটা কারণ এই যে, জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও সাহায্য প্রাপ্তির প্রবনতা খুব বেশী থাকে। ফলে তারা যে কোন দুর্যোগ/ দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতিকে বাড়িয়ে বলেন, এবং প্রাপ্ত ত্রাণ/ সাহায্যকে কমিয়ে বলে আরও ত্রাণ/সাহায্য পাবার পথ সুগম করতে চান। এরূপ তথ্য সংগ্রহ করে সরকারী সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা গ্রহণ জটিল অবস্থা ধারণ করে। গ্রামাঞ্চলে ডিপ-টিউবওয়েল বসানো বা রাস্তা নির্মাণ জনিত গবেষণার তথ্য সংগ্রহে এরূপ ভ্রান্ত তথ্য চরম ক্ষতির কারণ হয়। যেমন—১ টি ডিপ-টিউবওয়েলের ২ মাইলের মধ্যে আরেকটি ডিপ-টিউবওয়েল বসানো নিরাপদ নয়। কিন্তু ভ্রান্ত তথ্য প্রদানের ফলে বহুস্থানে আধা মাইলের মধ্যে দুটি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে। স্কুল/কলেজ নির্মাণের তথ্যও এভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে।

(৪) **গবেষণা কর্মকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে না করা ঃ** কেবল অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিত জনগণও এদেশে সামাজিক গবেষণাকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করেন না। চাকরিজীবীগণ এক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে থাকেন। তারা সময় ও মনোযোগ দিয়ে কোন তথ্য দিতে চান না। কোন বিষয়ে সুপারিশ বা মন্তব্য তো সর্বতোভাবে পরিহার করেন।

তার ফলে দিনের পর দিন তথ্য প্রাপ্তির জন্য ঘোরাঘুরি করতে হয় এবং তথ্য পাওয়া গেলেও তা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে না।

অনেক শিক্ষিত লোক এরূপ মন্তব্য করেন যে,—"এত খাটুনী করে এবং আমাদেরকে বিরক্ত করে তথ্য নেবার দরকার কি? ঘরে বসে পূরণ করে নিলেই পারেন" —বস্তুতঃ এদেশে "ঘরে তৈরী তথ্য বা "Manufactured data"-র খুব একটা অভাব দেখা যায়না। যার জন্যে সামাজিক গবেষণার সকল সেক্টর, বিশেষ করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভ্রান্ত তথ্য দ্বারা পরিচালিত হবার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে এমনকি জেলা প্রশাসক পর্যায়েও বেশ ক'জনের নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তথ্য দিনের পর দিন ঘুরেও পাওয়া যায়নি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তথ্য প্রদানের জন্য নথি-পত্র পর্যালোচনার কষ্টটুকু স্বীকার করতে আগ্রহী থাকেন না। তারা গবেষণা কর্মকে 'মুল্যহীন কর্ম' বলে মনে করেন এবং তাদের নিকট তথ্য চাওয়াকে "বিরক্তিকর আবেদন" বলে বিবেচনা করেন। এরূপ মানসিকতার কারণে 'জাতীয় বেতন কমিশন' বা 'জাতীয় শিক্ষা কমিশনের' মত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের তথ্য সংগ্রহ দুরূহ কার্যে পরিণত হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রার তথ্য প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়না।

(৫) **মধ্যম মানে অবস্থান- প্রবণতাঃ** এদেশের উত্তরদাতাদের মধ্যে মধ্যম মানে অবস্থানের প্রবণতা' এত বেশী থাকে যে, কোন বিষয়ে যথার্থ ও নির্ভুল উত্তর তারা দিতে চান না। যেমন বলা যায়— "উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন জনগণের জন্য কতটা উপকার বয়ে এনেছে?" এরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে যদিঃ

(ক) প্রভূত উপকার বয়ে এনেছে

(খ) মোটামুটি উপকার বয়ে এনেছে

(গ) তেমন একটা উপকার বয়ে আনেনি

এরূপ ৩টি উত্তর দ্বারা 'রীতিবদ্ধ' বা Closed করা হয়, তাহলে ১০০জন উত্তরদাতার প্রায় ৯০ জনই 'মোটামুটি' এই উত্তরে টিক চিহ্ন দিবেন। ১ বা ৩ নম্বরের উত্তরটি তার মনের কথা হলেও "পাছে লোকে কিছু বলে" প্রক্রিয়ায় মধ্যম মানে টিক চিহ্ন দিয়ে থাকেন। এরূপ মানসিকতার ফলে প্রকৃত সত্য উদঘাটন সামাজিক গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয়না।

সামাজিক গবেষণা সমাজের যে কোন সমস্যার কারণ, যে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন এবং যে কোন বিষয়ের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে গবেষকের প্রকৃত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকলে বা সংজ্ঞার ভুল থাকলে যেমন কাঙখিত তথ্য পাওয়া দুর্লভ হবে, তেমনি উত্তরদাতাদের মানসিকতা ও সততার অভাবেও সামাজিক গবেষণা বিপথগামী হতে বাধ্য। বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা আরম্ভ হয়েছে বলতে গেলে মাত্র তিন দশক আগে। বিগত ২ দশক ধরে এই প্রকার গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। প্রারম্ভ কালেই যদি তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী ও তথ্য সংগ্রহকালবর্তী সমস্যাবলী দূরীকরণে গবেষক ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ একাত্ম হয়ে প্রচেষ্টা চালান, তাহলে তথ্য সংগ্রহ জনিত ভ্রান্তি দূর করা সম্ভবপর হবে।

পর্যালোচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। আব্দুস সালাম আনসারী, "Social Rescarch in National Development", পাকিস্তান একাডেমী অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পেশোয়ার ১৯৬৩।

২। সৈয়দ আলী নকী—"সমাজ বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি", বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৭৬।

৩। বেগম নাজমীর নূর, "সামাজিক গবেষণা পরিচিতি", নলজ ভিউ, ঢাকা–১৯৮৪, পৃষ্ঠা–১৫৪।

৪। বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্টাটিসটিকস, "শিক্ষা জরীপ–১৯৮৮", বিবি এস, ঢাকা, ১৯৮৯,

৫। মিঞা/মিয়্যান, "পরিসংখ্যান পরিচিতি", আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা–১৯৮৮ পৃষ্ঠা ৯৫২।

৬। Seltiz, claire and others, "Research methods in Social Relations", Halt Rinehart and Winstar, New york, 1962.